এরশাদ শিকদারের শেষ ৪৮ ঘন্টা

ফাঁসির আদেশনামা শোনার পর এরশাদ শিকদার নিজেকে 'ভাগ্যবান' বলে দাবি করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময়েও শিকদার ছিল ভীষণ স্বাভাবিক... এরশাদ শিকদারের জীবনের শেষ সময়গুলোর প্রত্যক্ষদর্শীদের দেখা বর্ণনা লিখেছেন ... বদরুদ্দোজা বাবু

ফাঁসির আর মাত্র ৬ ঘন্টা বাকি। ৩ নং কনডেম সেলে এরশাদ শিকদারের সামনে হাজির হন জেলার ফরমান আলী। এরশাদ শিকদার তখন কর্তব্যরত প্রহরীদের সঙ্গে গল্প করছিলো। অন্যান্য দিনে এ সময় সে ঘুমিয়ে কাটাতো। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, ভাই- বোনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবার কারণে মুড একটু ভালো ছিল। সে গল্পই করছিলো প্রহরীদের। জেলারকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে আসলো সেলের গেটের কাছে। প্রহরীরা দু'পাশে ঘিরে রেখেছে তাকে। এরশাদ শিকদার বললো, 'স্যার আমার একটা অনুরোধ রাখবেন। আমি আমার তিন ছেলে আর বড় ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। কালকে কিংবা পরশু যদি দেখা করা যেত তাহলে কিছু জরুরি কথা বলতে পারতাম। একটি বারের জন্য সুযোগ করে দেন স্যার।'

এরশাদ শিকদার তখনও জানতো না তার ঐ দিন রাত ১২.০১ মিনিটে ফাঁসি হবে। দেখা করতে আসা আত্মীয়-স্বজনরাও তাকে সে রকম আভাস দেয়নি। জেল কর্তৃপক্ষও

শেষ দেখা করতে আসা এরশাদ শিকাদারের দুই স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই ও অন্যান্যরা। সবাই মুখ লুকিয়ে ছিলেন ফটোসাংবাদিকদের ভয়ে।

ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জানায়নি। তবে সে আঁচ করতে পেরেছিলো দুই-তিন দিনের মধ্যে ফাঁসি হবে। এরশাদ শিকদারের এ অনুরোধ জেনে ফরমান আলী তাকে বললেন, 'আপনার সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছে। সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন আর সম্ভব নয়।'

কেঁপে উঠলো এক সময়ের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার। তখনই সে প্রথমে বুঝতে পারলো আজকেই তার ফাঁসি হচ্ছে। রক্ষীরা সবাই তাকিয়ে শিকদারের দিকে। শিকদার তাকিয়ে নিচে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলে। এরপর কাঁপা কাঁপা স্বরে সে জেলারকে আবার বললো, 'তাহলে স্যার এক কাজ করেন। একজন মৌলবী এনে আমাকে ভালো মতো তওবা পড়ান। পরে হয়ত সময় পাব না। আর ভুলেও যেতে পারি। আমার জন্য এই কাজটা অন্তত পক্ষে করেন।' 'ঠিক আছে' বলে জেলার ফরমান আলী ৩ নং কনডেম সেল থেকে চলে আসেন। এরপর শিকদার আর গল্প করেনি। হয়ত ইচ্ছা করেনি। প্রহরীরাও শুনতে চায়নি। বিছানার একপাশে নিচু হয়ে বসেছিলো এক সময়ের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার।

উপরের এই ঘটনাটি ছিল এরশাদ শিকদারের জেল জীবনের একটি সময়ের বিবরণ। এই জেল জীবনে সে একবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলো। এরপর থেকে তার হাতে পরানো হয় হ্যান্ডকাপ আর পায়ে ডান্ডাবেরি। এরপর থেকে তার জেল জীবন হয়ে ওঠে একঘেয়ে। প্রায় সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাতো ৩ নং কনডেম সেলে।

লম্বালম্বী ৯ ফুট ১২ ফুট ছোট একটি রুমের মেঝেতে কম্বল দিয়ে বিছানা পাতা। রুমের এককোনায় ছোট টয়লেট। রুমের ভিতরে দুইজন রক্ষী। একজন গেটের সামনে, অন্যজন বিছানায় শোয়া এরশাদ শিকদারের সামনে। গেটের বাইরে দুইজন রক্ষী। এদের মধ্যে একজন হাবিলদার। যার কাছে হ্যান্ডকাপ, ডান্ডাবেরির চাবি এবং গেটের চাবি। এরশাদ শিকদার হাবিলদারদের 'ওস্তাদ' বলে ডাকতো। প্রতিদিনকার মতো ৯ মে রবিবার এরশাদ শিকদার ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে সাতটার দিকে। হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওস্তাদ, পানি দেন।' এরশাদ শিকদার প্রতিদিন ১৫-১৬ লিটার পানি খেত। অন্যান্য খাওয়া দাওয়ার চাহিদা তেমন ছিল না।

পানি খেয়ে টয়লেটে গিয়ে এসে বিছানায় বসে এরশাদ শিকদার। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। হাবিলদারের উদ্দেশে বলে, 'ওস্তাদ আপনার আজকে ডিউটি কয়টা পর্যন্ত?' হাবিলদারের মুখে আজকে হরতাল শুনে শিকদার বলে ওঠে, 'আজকে আবার হরতাল কেন?' এমপি আহসানউল্লাহ মাস্টারের হত্যার খবর পায়। আপসোস করে বলে, 'উনি পপুলার লিডার ছিলেন। এলাকায় নাম ডাক আছে। আমি তারে চিনতাম। ভালো মানুষ ছিলেন।' কারা মারছে, কীভাবে মারা গেছে এসব জানতে চাইলে রক্ষীরা চুপ থাকেন।

পৌনে ৯টার দিকে তার নাস্তা আসে। সবজি ও ভাত খেয়ে শিকদার আবার ঘুমায়। সব সময় অবশ্য এই সময়ে ঘুমাতো না। মাঝে মাঝে গল্প করতো রক্ষীদের সঙ্গে। নিজের থেকেই গল্প বলতো। তবে কখনোই এমন গল্প বলতো না যেখানে সে অপরাধী। চতুর প্রকৃতির এরশাদ শিকদার কখনোই বর্ণনা দেয়নি তার হাতে হওয়া দুর্ধর্ষ হত্যাকান্ডের। কাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল, বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ, রাজনীতি, সব প্রসঙ্গই আসতো তার গল্পে। ১৫-২০ দিন আগে সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে সে বলে, 'কাদের সিদ্দিকী, বদরুদ্দোজা চৌধুরী আর উপরে উঠতে পারবে না। এরা সব বাদের খাতায়। বড় দলের ব্যানার ছাড়া কেউ সাইন করতে পারে না। লোক দেখ্যানো রাজনীতি করা লাগে। এরা কর্মী পাইবো কই। কর্মী না থাকলে কোনো দাম নাই।' দুর্ধর্ষ এরশাদ শিকদার জেলে এমনিতেই ম্রিয়মাণ ছিল। চেঁচামেচি খুব একটা করতো না। আপত্তি ছিল শুধু 'স্যালুট' দেওয়ায়। সেলের গেট দিয়ে কোনো বড় কর্মকর্তা ঢুকলেই হাবিলদাররা আসামিদের বলতেন দাঁড়িয়ে স্যালুট দিতে। একদিন জেল সুপার ঢুকলে হাবিলদাররা উঠে দাঁড়াতে বললে সে বলে, 'আমরা আসামিরা কি রাজশাহী, চট্টগ্রাম থাইক্যা আপনাগো মতো ট্রেনিং নিয়া আইছি নাকি যে স্যালুট দিতে পারমু।'

গোসলের পর পরই দুপুর ১টায় দিকে এরশাদ শিকদারের খাবার চলে আসে।

এরশাদ শিকদারের প্রাসাদ স্বর্ণকমলে এখন মাকর্সার জাল

রবিবার তার খাবারের তালিকায় ছিল ভাতের সঙ্গে সবজি, ডাল। খাবারের মান নিয়েও সে সমস্যা করতো না। যা বরাদ্দ ছিল সেটাই খেতো। দুপুরের খাবার খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় বসে থাকতো। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে আসে রাতের খাবার। খাসির মাংস, সবজি, ভাত দিয়ে খাবার খেয়ে একটু তাড়াতাড়ি সাড়ে ৯টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। রক্ষীরা তার পাশে জেগে থাকে সারারাত। রাতে দুই বার তার ঘুম ভাঙে। টয়লেটে যায়। হাবিলদার বাথরুম করিয়ে নিয়ে আসলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

১০ মে ফাঁসি কার্যকর হবে খবরটি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। যার ফাঁসি সে শুধু জানতো না। তবে সে আঁচ করতে পেরেছিলো মে মাসে কিছু একটা ঘটবে। এরপরও জেল থেকে বের হয়ে স্বাধীন জীবনের স্বপ্নও দেখতো। তিনদিন আগেও সে বলেছে, 'ভালো মতো চেষ্টা করলে আমি ছাড়া পেয়ে যেতাম'। ভালো উকিল দিয়ে মামলাগুলো চালানোর কথা বুঝিয়েছিলেন।

সোমবার খুলনা শহরের বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা শুনেছে ফাঁসি হবে আজকে, তবে নিশ্চিত নয়। কারণ এরশাদ শিকদারের ফাঁসির গুজব আগে কয়েকবার শহরে ছড়িয়েছে। তবে জেল এলাকায় ছিল ভিন্ন চিত্র। আগ্রহী মানুষ আর সাংবাদিকদের ভিড় ছিল। পুলিশের নিরাপত্তার কড়াকড়ি জানিয়ে দিচ্ছিলো আজ খুলনা জেলার কারাগারে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

জীবনের শেষ দিনটি এরশাদ শিকদার অন্যান্য আট-দশটা দিনের মতোই শুরু করেছিলো। একই সময় উঠেছিলো ঘুম থেকে। পানি খেয়ে বাথরুম করে বিছানায় শুয়ে আছে। এমন সময় জেল সুপার পরিদর্শনে এলেন। শিকদার বিছানায় শুয়ে আছে। জেল সুপার যাবার পর বিছানা থেকে উঠে বসলো। রক্ষীদের নাস্তা এলে জানতে চাইলো, 'কি নাস্তা এসেছে?' 'রুটি ও ভাজি' জানালো রক্ষী। কাছে নিয়ে রুটি দেখলো এবং বললো, 'এবারের আটাটা মনে হয় খারাপ পড়েছে।' হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার নাস্তাটা দিতে বলেন।'

নাস্তা শেষে ওষুধ খেয়ে নিলো এরশাদ। কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি করলো। আবার উঠে বসলো। বললো, 'এই গরমে ঘুম আসে না।' সাড়ে ৯টার দিকে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তার ঘুম ভাঙলো হাবিলদারের ডাকে। 'কি জেগে আছেন'- হাবিলদার একবার ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা থেকে উঠে বসলো এরশাদ শিকদার। 'আপনার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই এরা দেখা করবে আপনার সঙ্গে। আপনি কি দেখা করতে চান?' শিকদারের ত্বরিত উত্তর, 'হ্যাঁ, দেখা করবো। নিয়া আসেন।'

সাড়ে ১১টার মতো বাজে সেই সময়। কনডেম সেলের পাশে কিছুক্ষণ পর এসে দাঁড়ালো এরশাদ শিকদারের প্রথম স্ত্রী খাজিদা বেগম, শাশুড়ি ফরিদা বেগম, বড় ছেলে জামাল শিকদার, মেজ ছেলে কামাল শিকদার, ছোট ছেলে হেলাল শিকদার, মেয়ে সুবর্ণা ইয়াসমিন সাদ, ভাই মুজিবর শিকদার ও তার ছেলেমেয়েসহ আরো কয়েকজন। এদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে শিকদার বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার তোমরা? তোমরা সবাই কীভাবে আসলা?' উত্তর আসলো, 'জেল সুপার স্যার ডাকছে।' শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে আসা সবার চোখে তখন পানি। মেয়ে সাদ বাবাকে দেখে চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে, 'বাবা তোমার কিছু হবে না।' স্ত্রী খাদিজা মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে শিকদারের সামনে হাত দুটি রেখে কাঁদছে। এরশাদ শিকদার তখনও স্বাভাবিক ছিলো। মেয়ে সাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খাদিজার দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, 'আমি তোমাদের মাফ করবো না। তোমরাই আমাকে ফাঁসি দিলা। আমার জন্য একটু চেষ্টা করলে আমার গলায় দড়ি পড়তো না। তুমি আর তোমার মা এর জন্য দায়ী।' ছেলেরা পাশে কাঁদছে। বড় ছেলে বললো, 'বাবা আমরা চেষ্টা করেছি। সব জায়গায় গেছি। কিন্তু পারি নাই।' এরপর দাঁড়িয়ে ছিলো শিকদার কিছুক্ষণ। মেয়ের পড়াশোনার খবরাখবর নিলো। পাশ থেকে খাজিদা বলে, 'আমাকে মাফ কইরা দিয়েন।' শিকদার উত্তর দেয় না। সে চুপ করে থাকে। এরপর এরশাদ বলে, 'তোমাকে বলেছিলাম এবার আমার নামে দামী দেইখ্যা গরু কোরবানি দিতে। তোমরা দেও নাই। আমি প্রতিবার ১৪/১৫টি গুরু কোরবানি দিতাম। আমার টাকা-পয়সা লইয়্যা তোমরা কার্পণ্য দেখাইলা। আমার নামে কোরবানি দিলে আমি বাইচ্যা যাইতাম। আমার টাকা-পয়সা সবই তুমি হাত করছো। কাউরে দেওনা। আমার কেসের পেছনেও খরচ কর না। তোমারে আমি কেমনে মাফ করমু। তুমি এইখান থাইক্যা যাও।' খাজিদার কান্নার স্বর আরো বেড়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে, 'আমারে মাফ কইর‍্যা দেন।' এরশাদ শিকদার খাদিজার চেহারার দিকে তাকায় না। ছেলেদের উদ্দেশে বলে, 'তোরা আমারে না জানাইয়া বিয়া করলি। আমি তোদের বাবা। একবারের জন্যও জানালি না। অন্য মানুষ থাইক্যা শুনতে হয় তোরা বিয়ে করছস্।' মেজো ছেলে বলে, 'বাবা ভুল করছি মাফ কইর‍্যা দিও।' 'তোরা তো তোর বাবার জন্য একটু চেষ্টা করলি না। আমি তোদের জন্ম দিছি। তোরা তোদের মা আর নানীর কথায় চলছস্। এখনও সময় আছে সাবধান হইয়া যা।' ছেলেরা মনোযোগ দিয়া তার কথা শুনছে। শিকদার প্রায় দেড় ঘন্টার মতো সময় কথা বললো সবার সঙ্গে। জেল কর্তৃপক্ষ সময় শেষ বলে তাড়াও দিয়েছে দুই একবার। 'এখন তোমরা যাও। পরে আবার আইসো' বলে বিদায় জানালো সবাইকে। সবার চোখে পানি। শিকদারের চোখও ছলছল করছে। সে এখনও জানে না এটাই তাদের সঙ্গে তার শেষ দেখা। তবে ফাঁসির দিন যে ঘনিয়ে আসছে এটা বুঝতে পেরেছে। এরশাদ শিকদারের দীর্ঘদিনের সঙ্গী খাদিজা, ছেলেমেয়ে, ভাই

'তোমাকে বলেছিলাম এবার আমার নামে দামী দেইখ্যা গরু কোরবানি দিতে। তোমরা দেও নাই। আমি প্রতিবার ১৪/১৫টি গুরু কোরবানি দিতাম। আমার টাকা-পয়সা লইয়্যা তোমরা কার্পণ্য দেখাইলা। আমার নামে কোরবানি দিলে আমি বাইচ্যা যাইতাম। আমার টাকা-পয়সা সবই তুমি হাত করছো। কাউরে দেওনা। আমার কেসের পেছনেও খরচ কর না। তোমারে আমি কেমনে মাফ করমু

এরশাদ শিকাদেরর একসময়ের টর্চার সেলের ফাঁসিঘর

শেষবারের মতো চলে যাচ্ছে ৩ নং কনডেম সেল ছেড়ে। শিকদার যদি জানতো এটাই শেষ দেখা তাহলে কি করতো? হয়তো এমনই থাকতো। ভাবলেশহীন একজন মানুষ। বিছানায় গিয়ে বসে পড়লো এরশাদ। হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালো। হাবিলদারকে কাছে ডাকলো। বললো, 'আমার ছেলেদের আর মেয়েকে আবার একটু ডেকে দিবেন।' তিন ছেলে আর মেয়ে আবার আসলো। অন্যরা সেল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। এরশাদ শিকদার বললো, 'তোমার মায়ের জাহাজ মতির লগে ভালোবাসা আছে। হেয় কখনোই তোমাগো ভালো চাইবো না। 'তোমাদের দোষ আমি দেই না। তোমার মা আর নানী মিইল্যা সব কলকাঠি নাড়ছে। তোমরা যদি এখনো না বুঝ তাহলে রাস্তার ফকির হইয়া যাইবা। সম্পত্তি সব তোমার মা নিয়া যাইবো। আমারে বলছে একটা কিন্তু করছে আরেকটা। আমার খালিদ হত্যা মামলা ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দিয়া সামনে নিয়া আইছে। তা না হইলে এই মামলা আরো পরে কোর্টে উঠতো। আড়াই বছর বেশি বাঁচতে পারতাম। আমি বুঝে ফেলছি সবই তার কাজ। আর তোমরাও কোনো দৌড়াদৌড়ি কর নাই। মায়ের কথায় নাচছো।' সাদ এখনও কাঁদছে। 'কাদিস না মা' বলে শিকদার। 'বাবা তোমার কিছু হবে না, আমি তোমার জন্য দোয়া করমু'। বলে সাদ। ছেলেরাও কাঁদছে আর মাফ চাইছে। সাদ বললো, 'বাবা তুমি তো আমারে ভালোবাস। তাহলে ভাইয়াদের মাফ কইর‍্যা দেও। ওদের কোনো দোষ নাই' । 'তুই আমার মায়ের মত। মনে হয় আমার মা আমাকে বলছে। যা তোর জন্য ওদের মাফ কইর‍্যা দিলাম। বাবারা শোন তোরা সাদকে ভালো মতো পড়ালেখা করাবি। ডিগ্রি পাস করাবি। আর পড়ালেখা শেষ হইলে আর্মি , ডাক্তার কিংবা ভালো ছেলে দেইখ্যা বিয়া দিস। আর ঢাকায় আমার ৮ কাঠার ওপর একটা তিনতলা বাড়ি আছে। বিক্রি করলে ৫ কোটির উপরে টাকা পাবি। সাদের বিয়ার সময় ঐ টাকা দিয়া দিবি। বল দিবি?' ছেলেরা চুপ করে আছে। এরশাদ শিকদার আবার জানতে চায়, 'দিবি না।' ছেলোরা বলে, 'হ্যাঁ বাবা দিমু'।

এরপর এরশাদ শিকদার জীবনের শেষ দুপুরের খাবার খায়। খাসির মাংস, ডাল, ভাত দেওয়া হয় দুপুরে খাবারে। আত্মীয়-স্বজনরা চলে যাবার পর তাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। ভাত খাবার পরই দেখা করতে আসে তার বড় ভাই আশরাফ শিকদার। সঙ্গে ছিলো বোন সেলিনা বেগম। মেজো ভাইয়ের মেয়ে। বড় ভাই ও বোনের ছেলে-মেয়েরা। রক্ষী তাদের আসার খবর দেওয়ার পর এরশাদ শিকদার বললো, 'সবাই আজকে আসছে কেন?' রক্ষীরা তার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি। একজন রক্ষী বললো, 'আজকে তো আপনার পায়ে ডান্ডাবেরি নাই। ভালো মতো হাঁটা চলা করতে পারতাছেন।' এরশাদ

পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এরশাদ শিকদারের বরফ কল ও টর্চার সেল

শিকদার মুচকি হেসে বললো, 'হু। এইতো আর দুই একদিন চলতে পারমু। তারপরে তো শেষ।'

ছোট বোন সেলিনা এরশাদ শিকদারকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে দিলো। শিকদার একদৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বলছে না। বোন এতদিন কেন যোগাযোগ করতে পারেনি সে ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

সেলিনা বলছে, 'আমি ওয়ার্ড থেকে ১৮ হাজার মানুষের সই নিয়া গেলাম স্বর্ণকমলে, তোমার বউ আমারে পিটাইয়া ভাগাইয়া দিলো। আমারে বিভিন্ন কথা কইয়া অপমান করলো। আমি চেষ্টা করছি ভাই। তোমারে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।' এরশাদ শিকদার বললো, 'ওরা আসছিলো দেখা করতে। আমি যা বলার বলছি। তুই কাঁদিস না।'

মেজ ভাই কোথায় জানতে চাইলো শিকদার। অসুস্থ শুনে ওনার মেয়েকে বললো, 'ভাইয়ের দেখাশুনা করিস। আর গ্রামে আমার ২০/২২ বিঘা জমি আছে। ঐগুলো তোরা খাইস। কাউকে দেওয়া লাগবো না।' বড় ভাই আশরাফ আলী শিকদারের জামাই জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার মৃত্যুর পর আমার কোন গোরস্থানে আপনাকে নিয়া যামু?' এরশাদ শিকদার একটু বিরক্ত হলো এ প্রশ্ন শুনে। এরপর বললো, 'কার কখন মৃত্যু হয় কেউ বলতে পারে না। যদি মারা যাই তাহলে টুটপাড়া গোরস্থানে কবর না দিয়া নিয়া যাবি বসুপাড়া গোরস্থানে। ঐখানে অনেক বুদ্ধিজীবীদের কবর আছে। হেগো পাশে কবর দিবি। পাশে মসজিদ আছে। মানুষ মাঝে মধ্যে দোয়া করবো। তোরা এরপর দরখাস্ত নিয়া আসিস আমি সই কইরা দিমু। আমার লাশের কবর দিবি তোরা। গোসল করানো লাগবো না। জেলেই গোসল দিয়া দিব। তোরা শুধু মাটি দিবি।' বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনে আমারে মাফ কইরা দিয়েন।' বোন সেলিনা তখনও কাঁদছে। ভাই গো ভাই ভিড়কে আরো উস্কে দিয়েছে এরশাদ শিকদারের দ্বিতীয় স্ত্রী সানজিদা নাহার শোভা। কারাগারের বাইরে শিকদারের সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় শোভা দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সাড়ে চার বছরের মেয়ে এশা। এরশাদ শিকদার যখন জেলে যায় শোভা তখন চার মাসের গর্ভবতী। মেয়ে এশাকে নিয়ে শোভা এর কাঁদছে। দু'জনই দু'জনের চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন। এক পর্যায়ে এরশাদ শিকদার বললো, 'তুমি আসছো কেন?' শোভা উত্তর দেয় না, কাঁদে। এশা মায়ের কান্না দেখছে। শোভা এশার দিকে তাকিয়ে বলে, 'পাপ্পাকে জিজ্ঞাসা কর, পাপ্পা তুমি কেমন আছ'। এশা বলে না। শিকদার নিচু হয়ে ফ্লোরে বসে। এশাকে ডাকে, 'মা তুমি এদিকে আসো।' এশা দূরে চলে যায়। জেল সুপার, জেলার কাছে টেনে দেয়। এশার হাত দুটি ধরে এরশাদ শিকদার। সবাই বলতে বলে, 'পাপ্পা কেমন আছ' এটা জিজ্ঞাসা করতে। শোভাও বলে। এশা একবার বলতে গিয়ে থেমে যায়। তারপর 'পাপ্পা তুমি কেমন আছ' বলে মায়ের পায়ের কাছে চলে আসে। এরশাদ শিকদার বলে, 'মা তোর জন্য আমি কিছু করে যেতে পারলাম না। আজকে যদি আমার কাছে টাকা থাকতো তাহলে তোকে ১ কোটি টাকা দিয়ে যেতাম। আমাকে মাফ করে দিস মা।' এশা তার বাবা শিকদারের এ কথাগুলোর অর্থ কিছুই বোঝে না। শুধু কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকে। মায়ের পেছনে চলে যায় এশা। এগিয়ে আসে শোভা। 'আমাকে মাফ করে দিও শোভা। আমার কাছে কোনো ক্ষমতা, সম্পত্তি নাই। সব বড় জনের কাছে। মাফ করে দিও আমাকে।' এরশাদ শিকদার স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই কথাগুলো বলে শোভাকে । শোভাও মাফ চায় এরশাদ

শেষ দুই দিন এরশাদ শিকদার ছিল নিরুত্তাপ। আসলে জেলে যাবার পর তার সেই ভয়ঙ্কর চেহারা ছিল না। তাই শেষ ৪৮ ঘন্টাতে বিচার করা ঠিক হবে না একজন মানুষকে। শেষ সময়ে তার প্রতি দুর্বলতাই অনুভব করেন একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু পুরো জীবনচিত্র বিবেচনা করলে মনে হবে নির্মম হলেও এটাই হওয়া উচিত

গো চিৎকারে আশপাশের সেলের আসামিরা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে। এভাবেই কনডেম সেল থেকে বেরিয়ে আসলো সবাই।

২.৩০। এরশাদ শিকদার আবার বিছানায় আসলো। রক্ষীকে বললো ওষুধ দেওয়ার জন্য। টয়লেট করে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এপাশ ওপাশ করছে। ঘুমানোর চেষ্টায় চোখ বন্ধ করলো। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে শিকদার। ভিতরের রক্ষীরা তার দিকে তাকিয়ে। কারাগারের বাইরে তখনও উৎসুক মানুষের ভিড়। সেই আগে দুইবার এরশাদ শিকদারের সঙ্গে দেখা করেছে। জেল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এশা ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা মা-মেয়ের দিকে তাক করা। শোভার চেহারা ওড়না দিয়ে একেবারে ঢাকা। ফটো সাংবাদিকদের ভয়ে মুখ লুকিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জেল গেটের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভিতরে। শিকদার তখন জেগেই ছিলো। শোভা আসার কথা শুনে সেলের সামনে এগিয়ে এলো। শোভা মুখ ধরে

শিকদারের কাছে। শিকদার বলে, 'তোমার দোষ নাই। সব দোষ খাদিজার। আমি ওর কারণে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি নাই। আমি এখন মৃত্যুপথের যাত্রী। তুমি আবার বিয়ে কইরো।'

২০ মিনিটের মতো শোভা দেখা করার সুযোগ পায়। তারপর চলে যেতে হয়। শিকদার শিকের কাছে এসে আবার ডাক দেয় শোভাকে। বলে, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি বিয়ে করলে এশার কি হবে? এশাকে যদি পার তোমার কাছে রেখো, তা না হলে আমার বোনের কাছে দিয়ে এসো। সে লালন পালন করবে।'

৩ নং কনডেম সেলে এরশাদ শিকদারের এরপরের সময় কাটে একাকী। আত্মীয়স্বজনরা সবাই শেষ দেখা করে গিয়েছেন। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়ের সন্ত্রাসী এরশাদ শিকদার। হয়তো সে আন্দাজ করতে পেরেছিল কিছু একটা হবে। সিদ্ধান্ত এসে গেছে। কিন্তু আজকে যে তার ফাঁসি হবে তা বুঝতে পারেনি সে। সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়ার অর্থ হয়তো সে মনে মনে খুঁজছিলে। ভেবেছিলো দুই একদিনের সময় তার হাতে আছে। সে জন্যই বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পর জেলারকে দেখে তিন ছেলে ও বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলো। তখনই বুঝে গেছে তার কাছে বেঁচে থাকার সময় আছে মাত্র কয়েক ঘন্টা।

রাতের খাবার খেয়ে এরশাদ আর ওষুধ খায়নি। বিছানার একপাশে বসে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিলো। রক্ষীরাও দেখছিলেন কয়েক ঘন্টা পরে নিশ্চিত মৃত একজন মানুষকে। নিশ্চিত মৃত্যুর খবর জেনেও শিকদার ঘুমিয়েছিলেন। তবে সে ঘুমে ছিলো না গভীরতা। মাঝের দুই ঘন্টা ঘুমের মধ্যে জেগে ছিলো কয়েকবার। হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছিলো তার সেই ক্ষমতায় দিনগুলোর কথা।

এরশাদ শিকদারকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার ফাঁসির কথা জানানো হয় রাত ১০টার দিকে। তার আগে সে রুই মাছ, সবজি দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলো। জেলার ফরমান আলী একটি কাগজ বের করে তার ফাঁসির কারণ পড়ে শোনালেন। নিম্ন, উচ্চ রায়গুলো একে একে পড়ে শোনানো হলো এরশাদ শিকদারকে। দীর্ঘ এই পাঠের শেষ কথাটি ছিল... 'আপনার ফাঁসি কার্যকর হবে আজ রাত ১২.০১ মিনিটে।' শিকদার মনে মনে প্রস্তুত ছিলো। সে সময় এমন কি ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগ পর্যন্ত সে ছিল স্বাভাবিক। তার চলাফেরার কিংবা চেহারার কোনো অস্পষ্টতার ছাপ দেখা যায়নি। জেলার ফাঁসির রায় কার্যকরের আদেশনামা শোনানোর পর এরশাদ শিকদার বললো, 'আল্লাহ আমাদের সবার মৃত্যু লিখে রেখেছেন। আমরা কেউ জানি না কখন, কোথায় আমাদের মৃত্যু হবে। সে দিক দিয়ে আমি অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান। আমি জানি আমার মৃত্যু কখন হবে।'

ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগ পর্যন্ত সে ছিল স্বাভাবিক। তার চলাফেরার কিংবা চেহারার কোনো অস্পষ্টতার ছাপ দেখা যায়নি। জেলার ফাঁসির রায় কার্যকরের আদেশনামা শোনানোর পর এরশাদ শিকদার বললো, 'আল্লাহ আমাদের সবার মৃত্যু লিখে রেখেছেন। আমরা কেউ জানি না কখন, কোথায় আমাদের মৃত্যু হবে। সে দিক দিয়ে আমি অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান। আমি জানি আমার মৃত্যু কখন হবে'

এর আগে এরশাদ শিকদারকে গোসল করানো হয়। গোসল করে সে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে। নামাজের পর মৌলবী তাকে তওবা পড়ান। কলেমা পাঠ করান। আদেশনামা শোনার পর সে শুধু 'আল্লাহ' আল্লাহ' বলে জিকির করতে থাকে। আর সঙ্গে 'লা ইলাহা ইল্লালাহু... কলেমা পড়ে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিন জল্লাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এরশাদ শিকদারকে। নতুন কাপড় পরিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে রাত ১২টা বাজার ৫ মিনিট আগে তাকে নিয়ে আসা হয় ফাঁসির মঞ্চে। শিকদার তখন ভীষণ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পাশে থাকা দু'জনের সঙ্গে হেঁটে এসে ফাঁসির মঞ্চে ওঠে। আর জোরে জোরে কলেমা পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে বলে উঠলো 'আপনারা সবাই আমাকে মাফ করে দিয়েন।' চিৎকার করে বার বার বলতে থাকলো সে কথা। জল্লাদ একজন এসে ফাঁসটি গলায় পরিয়ে দিলো। সবাই অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। শিকদার বলে উঠলো, 'আমার ফাঁসটি হালকা করেন আমি জোরে জোরে কলমা পড়বো।' ফাঁসটি হালকা করা হলো। জোরে জোরে কলমা পড়তে লাগলো দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, খুলনার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক এরশাদ শিকদার। অনবরত কলমা পড়ে যাচ্ছে সে। চারপাশে পিনপতন নীরবতা। জল্লাদ তাকিয়ে আছে নির্দিষ্ট একটি হাতের দিকে। হাতের রুমালটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকদারের পায়ের নিচের পাটাতনটি সরে গেলো নিমিষে। ফাঁসিতে ঝুলে পড়লো এরশাদ শিকদার। প্রায় ৩০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখা হলো তাকে। ডাক্তার মৃত্যু নিশ্চিত করার পর নামানো হলো।

শেষ দুই দিন এরশাদ শিকদার ছিল নিরুত্তাপ। আসলে জেলে যাবার পর তার সেই ভয়ঙ্কর চেহারা ছিল না। তাই শেষ ৪৮ ঘন্টাতে বিচার করা ঠিক হবে না একজন মানুষকে। শেষ সময়ে তার প্রতি দুর্বলতাই অনুভব করেন একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু পুরো জীবনচিত্র বিবেচনা করলে মনে হবে নির্মম হলেও এটাই হওয়া উচিত। এটাই কাম্য। সন্ত্রাসী খুনির পরিণতি এমন হলে অশান্ত বাংলাদেশ শান্তির সন্ধান খুঁজে পাবে। সন্ত্রাসীরাও ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থাকবে না। টর্চার সেল তৈরি হবে না। নিহত হবে না নিরপরাধী। জন্ম নেবে না নতুন এরশাদ শিকদার। এশার মতো কাউকে অকারণে জীবনভর কষ্ট বয়ে বেড়াতে হবে না।